হিন্দু সংহতি

সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

প্রথম বর্ষ, দশম সংখ্যা, মে ২০০৯, কলকাতা ❁ মূল্য ঃ ১.০০ টাকা

ইসলাম যদি মানুষের মানসিকতাকে নিয়ে যায় মধ্যযুগীয় অন্ধকারে তাহলে মার্কসবাদ মানুষের মানসিকতাকে পৌঁছে দেয় একেবারে প্রস্তরযুগে। দয়া মায়া স্নেহ মমতা বিবেক বুদ্ধি বর্জিত এক নির্মম নিষ্ঠুর নিরেট প্রস্তরীভূত মানসিকতার নাম মার্কসবাদ।

—শিবপ্রসাদ রায়

আমাদের কথা

পনেরতম (১৫) লোকসভা নির্বাচন হয়ে গেল। সারা ভারতে কংগ্রেস জয়ী। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল। যা কেউ ভাবতেও পারেনি, ৩২ বছরের সেই দুর্ভেদ্য বাম দুর্গ ধসিয়ে দিলেন শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জী। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ২৩৫—৩০-এর অহমিকাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে ২৬-১৫তে দাঁড় করিয়ে দিলেন। অর্থাৎ বামেরা মাত্র ১৫, আর মমতার জোট ২৬। আগের লোকসভা নির্বাচনে এই বামেরা পেয়েছিলেন ৩৫। সেখান থেকে নামিয়ে ওদেরকে ১৫তে নিয়ে এলেন মমতা। আর তাঁর জোটকে ৭ থেকে নিয়ে গেলেন ২৬-এ। তার মধ্যে নিজের দলকে ১ থেকে নিয়ে গেলেন ১৯-এ। কম্যুনিষ্টদের শেষের শুরু হয়ে গেল। তাদের ঔদ্ধত্য চূর্ণ। আলিমুদ্দিনে কাউন্ট ডাউন শুরু হয়ে গেছে।

বিগত ৩২ বছরে এই বাম দুর্গ ভাঙতে অনেক রথী-মহারথীরা চেষ্টা করেছেন। প্রিয়, সুব্রত, সোমেন, প্রণব, এমনকি সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কেও মাঠে নামানো হয়েছিল, প্রয়াত বরকত গণিখান চৌধুরীও চেষ্টা করেছেন। সকলেই ব্যর্থ হয়েছেন। সফল হলেন মমতা। মমতার এই সাফল্যের পিছনে কারণ কী? কোন্ মন্ত্রে মমতা এই দুর্ভেদ্য দুর্গ ধসিয়ে দিলেন?

মন্ত্র অবশ্যই একাধিক ছিল। অন্যতম মন্ত্র মুসলিম ভোট। সারা পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরা সিপিএম-কে ভোট দেয়নি। দিয়েছে মমতার জোটকে। এজন্য মমতা যথেষ্ট পরিমাণে মুসলিম তোষণ করেছেন। মুসলিমদেরকে তুষ্ট করার জন্য তাঁর বিশ্বস্ত সঙ্গী বিজেপি-কে পরিত্যাগ করেছেন। এসবের ফলও পেয়েছেন। মুসলমানরা তাঁকে ঢেলে ভোট দিয়েছে। এছাড়া কংগ্রেসকে সঙ্গী করে বিরোধী ভোট ভাগ হওয়া আটকেছেন। কিন্তু মমতার সাফল্যের পিছনে এগুলোই একমাত্র কারণ নয়। মুসলিমরা মমতাকে ভোট দিয়েছে, হিন্দুরা কি দেয়নি? দিয়েছে, প্রচুর দিয়েছে। মমতা যখনই ডাক দিয়েছেন, লক্ষ লক্ষ মানুষ রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে। কই, আর কেউ ডাকলে তো আসেনা। এমনকি যারা সংগঠনে অত্যন্ত পারদর্শী, তারা ডাকলেও তো এত মানুষ পথে নামেনি। তাহলে কি এটা ভাবতে হবে না যে, মমতার কী সেই যাদু? তিনি সাদাসিধে আটপৌরে সাধারণ শাড়ি পড়েন, তাই দেখেই কি সাধারণ মানুষ এভাবে তাঁর ডাকে ছুটে আসে?

না, তা কখনই নয়। মমতার এই ঐতিহাসিক জয়কে আমরা যেন ছোট করে না দেখি। যেন না ভাবি যে মমতা ফাঁকতালে বা বাইচান্স জিতে গিয়েছেন। না, তা নয়। তাঁর জেতার পিছনে সব থেকে বড় কারণ তাঁর সাহস, উদ্যম ও আপোষহীন সংগ্রাম। মানুষ সমাজসেবীকে ভালবাসে, সংগঠককে ভালবাসে,কিন্তু তার থেকেও অনেক অনেকগুণ বেশী ভালবাসে সাহসী ও সংগ্রামী যোদ্ধাকে। বিশেষ করে, সাধারণ মানুষের উপর যখন অর্থবান বা শক্তিমানের অত্যাচার হয় সেইসময় কেউ যদি সেই অত্যাচারিতের পাশে দাঁড়িয়ে অত্যাচারীর

আমেরিকা বিদেশ দপ্তরের রিপোর্ট ঃ

২০০৮ সালে বিশ্বে সর্বাধিক জঙ্গী আক্রমণ হয়েছে ভারতে

আমেরিকার বিদেশ দপ্তর এক রিপোর্টে জানিয়েছে যে ২০০৮ সালে সারা বিশ্বের মধ্যে সবথেকে বেশী সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ হয়েছে ভারতে। ২৬ নভেম্বর'০৮ মুম্বইতে জেহাদী হানায় মোট ১৮৩ জন ব্যক্তি নিহত হয়েছেন যাদের মধ্যে ২২ জন ছিলেন বিদেশী ও ১৪ জন পুলিশ ও নিরাপত্তাকর্মী। এছাড়া ৩০০ জন আহত হয়েছিলেন।

এই মুম্বই হামলা ছাড়াও গত এক বছরে যে বড় বড় হামলাগুলি হয়েছে, তার মধ্যে আছে—

(১) জয়পুর, ১৩ই মে ঃ এইদিন রাজস্থানের জয়পুর শহরে জনাকীর্ণ বাজার ও মন্দিরে জেহাদীদের দ্বারা ধারাবাহিক বিস্ফোরণে ৬০ জন নিহত এবং ১৫০ জন আহত হয়।

(২) মালকানগিরি, উড়িষ্যা, ২৯ জুন ঃ উড়িষ্যার মালকানগিরি জেলায় মাওবাদীদের দ্বারা বিস্ফোরণে ৩৩ জন পুলিশ ও নিরাপত্তাকর্মী নিহত হয়।

(৩) কাবুলে ভারতীয় দূতাবাস, ৭ জুলাই ঃ এইদিন আফগানিস্তানে ভারতীয় দূতাবাসে জঙ্গীদের দ্বারা বিস্ফোরণে দু'জন ভারতীয় দূতাবাস কর্মী নিহত হন।

(৪) ব্যাঙ্গালোর, ২৫ জুলাই ঃ ব্যাঙ্গালোর শহরে ধারাবাহিক বিস্ফোরণে ১ জন ব্যক্তি নিহত এবং ৮ জন আহত।

(৫) আমেদাবাদ, ২৬ জুলাই ঃ গুজরাতের রাজধানী আমেদাবাদে বাজার, হাসপাতাল ও বাসে ২১টি ধারাবাহিক বিস্ফোরণে ৫৪ জন নিহত, ১৫৬ জন আহত।

(৬) দিল্লী, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ এইদিন দিল্লীতে করোলবাগ বাজার ও অন্যান্য জনবহুল এলাকায় বিস্ফোরণে ২০ জন মৃত এবং ৮০ জন আহত।

(৭) আসাম, ৩০ অক্টোবর ঃ এইদিন আসাম রাজ্যের অনেকগুলি স্থানে একযোগে ধারাবাহিক বিস্ফোরণে ১১০ জন নিহত হয়।

এই তালিকা দেওয়ার পর আমেরিকার ওই বিদেশ দপ্তরের রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়েছে যে, এতগুলি বিস্ফোরণের ঘটনায় একজন অপরাধীরও এখনও পর্যন্ত বিচার হয়নি বা শাস্তি হয়নি। জঙ্গী হামলার অপরাধীদের বিচারের ব্যাপারে ভারতের আইন অপর্যাপ্ত এবং ব্যবস্থা কমজোর। ভারত সরকার জানিয়েছে যে এই সকল জেহাদী হামলা ও বিস্ফোরণের পিছনে লস্কর-ই-তৈবা, জইশ-ই-মহম্মদ ও হরকত্-উল-জিহাদী ইসলাম (বাংলাদেশ) এই তিনটি সংগঠনের হাত আছে।

অর্থাৎ ভারত সরকার সব জানে, কিছু করতে পারে না। বিশ্বের সর্বাধিক সন্ত্রাসবাদী হামলায় আক্রান্ত দেশ হওয়া সত্ত্বেও এই হামলা ও প্রাণক্ষয় আটকাতে কঠোর আইন পাস করতে ভারত সরকার অনিচ্ছা ও দ্বিধা দেখিয়েছে, তাতে একটা কথাই মনে হয় যে ভারত সরকারের কাছে ভারতবাসীর প্রাণের কোন মূল্য নেই। সেই ভারত সরকারই পুনরায় নির্বাচিত হল। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে যে ভারতবাসীর কাছে এর কোন বিকল্পও নেই। কারণ, এর আগের বিজেপি সরকারের আমলেও মানুষ দেখেছে একের পর এক সংসদ হামলা, কান্দাহার বিমান অপহরণ কাণ্ড, অক্ষরধাম হামলা, লালকেল্লা হামলা, রঘুনাথ মন্দির হামলা। তখন পোটা আইন ছিল। কিন্তু তাতেও হামলা আটকায়নি। এবার যেমন ২৬/১১ মুম্বই হামলায় ভারতের মাথা নীচু হয়েছে, বিজেপি আমলেও কান্দাহার কাণ্ডে ভারতের মাথা নীচু হয়েছিল। তবু আমাদের রাজনীতিবিদরা কোন কড়া পদক্ষেপ নিতে একান্তই অনিচ্ছুক। কারণ, পোটার বিরুদ্ধে সবথেকে সরব ছিল ভারতের মুসলমানরা। তাই জেহাদী সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিলে ভারতের মুসলমানরা অসন্তুষ্ট হবে বলেই রাজনীতিবিদদের এই অনিচ্ছা। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, যতদিন ভারতে মুসলিম ভোটব্যাংক থাকবে ততদিন এদেশে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কোন কড়া পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না। আর যতদিন মুসলমানের ভোট থাকবে ততদিন মুসলিম ভোটব্যাংকও থাকবে। এই ভোটব্যাংক কি ভারতে চিরকাল থাকবে? না। এদেশে মুসলিমরা যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যাবে, তখন তাদের অন্তর্দ্বন্দ্বে তাদের ভোটব্যাংক বিভক্ত হবে। ততদিন পর্যন্ত আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে জেহাদী সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য। শুধু তখন ভারতটা ভারত থাকবে, না অন্য কোন নাম হবে তা তখনই জানা যাবে।

নাবালিকা নয়না সরদার অপহরণের প্রতিবাদে সন্দেশখালি থানায়

হিন্দু সংহতির বিক্ষোভ প্রদর্শন

সন্দেশখালি থানার ভাটিদহ গ্রামের ১৩ বছর ১০ মাসের নয়না সরদার। উদ্ধারের এক সপ্তাহের মধ্যে দ্বিতীয়বার অপহরণ হয়। অপহরকারী একই ব্যক্তি রফিকুল শেখ। প্রথম অপহরণ হয় ৩ ফেব্রুয়ারী।

উদ্ধার করা হয় পাশের গ্রাম তালতলা শাকদার রফিকুল শেখের ভগ্নিপতি সাইবদ্দি মোল্লার বাড়ি থেকে। ১৯ ফেব্রুয়ারী বসিরহাট কোর্টে হাকিম নয়না সরদারের জবানবন্দীতে নয়নাকে তার মা-বাবার হাতে তুলে দেয়। বাড়িতে নিয়ে আসলে রফিকুল ও তার সাকরেদরা মোটরবাইক নিয়ে বারবার নয়নার বাড়ির আশেপাশে ঘোরাঘুরি করতে থাকে। নিরাপত্তার জন্য নয়নার মা-বাবা তাকে মামারবাড়ি বাসন্তী থানার শিকারিপাড়া গ্রামে পাঠিয়ে দেয়। গত ২৭ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা ৬-৩০ টায় রফিকুল শেখ ও তার শাকরেদরা মোটরবাইক নিয়ে হানা দেয় নয়নার মামারবাড়ি। বাড়িতে পুরুষরা কেউ না থাকায় বৃদ্ধা দিদিমাকে ধাক্কা মেরে গ্রামের লোক জড় হওয়ার আগেই বাইকে করে নয়নাকে

শেষাংশ দ্বিতীয় পাতায়

অসমকে ইসলামিক রাষ্ট্র বানাতে তৎপর
২২টি মুসলিম জঙ্গী সংগঠন

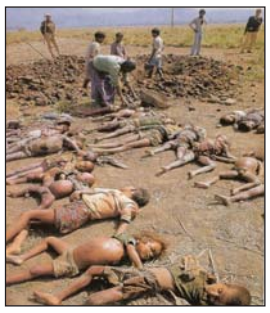

১৯৮৩ সালে আসামে আদিবাসী ও বাংলাদেশী মুসলিমদের সংঘর্ষে নেলি গণহত্যা

নিম্নে কয়েকটি নাম দেওয়া হল —

সংগঠনের নাম	প্রতিষ্ঠার সাল	প্রধান নেতার নাম	লক্ষ্য/উদ্দেশ্য
মুসলিম ভলান্টিয়ার্স ফোর্স	১৯৮৪	গুলিট মহম্মদ	অসম পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে একটি ইসলামিক রাষ্ট্র গঠন।
স্টুডেন্ট ইসলামিক মুভমেন্ট অব ইন্ডিয়া	১৯৮৬	গুলিট মহম্মদ	মৌলবাদী ও সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের প্রচার কাজে সাহায্য করা।
সোসিয়াল রিফর্ম আর্মি অব আসাম	১৯৮৭	রফিক আলি	বলপূর্বক ধর্মান্তকরণ।
মুসলিম ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট আসাম	১৯৯০	মোহম্মদ রাহুল আমিন মোল্ল্যা	ইসলামি ল্যান্ডে অসম বাংলার একত্রীকরণ।
নর্থ ইস্ট মুসলিম ফ্রন্ট	১৯৯১	এ বি খান	শরিয়তের অধীনে মুসলমান লোকেদের উদ্বুদ্ধ করে ইসলামিক রাষ্ট্রগঠনে সাহায্য করা।
হরকত উল জেহাদ আল ইসলামিক	১৯৯২	এ বি খান	ইসলামিক সন্ত্রাসবাদীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া ও তাদের ভারতে প্রবেশ করতে সাহায্য করা।
ইসলামিক লিবারেশন আর্মি অব আসাম	১৯৯৩	আরিফ মহম্মদ	হিন্দু মহিলাদের ধর্মান্তরিত করা
হরকত উল মুজাহিদীন	১৯৯২	খলিলুদ্দিন সেখ	ইসলামিক সন্ত্রাসবাদীদের বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করাতে সাহায্য করা।
মুসলিম লিবারেশন টাইগার অব আসাম	১৯৯৩	আফ্রান আলী	অসমে ইসলামিক হোমল্যান্ড প্রতিষ্ঠা করা।
সাদ্দাম বাহিনী	১৯৯০	আফ্রান আলী	ধর্মান্তকরণ, মসজিদ, মাদ্রাসা স্থাপন।
পাসয়ান	১৯৯৫	আফ্রান আলী	অস্ত্র সরবরাহ ও সন্ত্রাসবাদী প্রশিক্ষণ।
মুসলিম অ্যাকশান ফোর্স	১৯৯৬	আফ্রান আলী	নিম্ন অসমে ইসলামিক মৌলবাদের প্রচার এবং বিস্তার।
আদম সেনা	১৯৯৬	মহম্মদ আহমদ মাসুদ	উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মুসলিম সন্ত্রাসবাদীদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা।
ইউনাইটেড ইসলামিক লিবারেশন আর্মি	১৯৯৫	মাসুদ আসিম	ইসলাম ধর্মপ্রচার এবং হিন্দুর জমি দখল।

[সূত্র ঃ দৈনিক যুগশঙ্খ (শিলচর), ৩১.৮.০৫]

প্রথম পাতার শেষাংশ

আমাদের কথা...

বিরুদ্ধে লড়াই করে, তখন তার পিছনে দাঁড়ায় সব মানুষ। আর এই অত্যাচারীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে চাই সাহস। যে সাহসী সেই বীর। আমাদের শাস্ত্রেই বলেছে—বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।

সাধারণ মানুষ দেখেছে—মমতা রাইটার্স বিল্ডিং-কে ভয় পাননি, লালবাজারকে ভয় পাননি, লাল ফেট্টি বাঁধা ক্যাডারদেরকে ভয় পাননি, বাদশা আলমের লোহার রডকে ভয় পাননি, টাটার অর্থশক্তিকে ভয় পাননি, লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন নির্ভয়ে। ছুটে গিয়েছেন অত্যাচারিতের পাশে। মানুষ দেখেছে, একবার দু'বার নয়, অনেকবার। পুলিশের লাঠি খেয়েছেন, গুণ্ডাদের রডের বাড়ি খেয়েছেন, ক্যাডারদের অশ্লীল গালাগালি খেয়েছেন, সুব্রত মুখার্জীদের মত দো-আঁশলা সিনিয়র দাদাদের কাছ থেকে অপমান সয়েছেন, প্রণব মুখার্জীর মত বিরাট নেতার বেইমানি সহ্য করেছেন, আনন্দবাজারের তীব্র জ্বালা ধরা ব্যাঙ্গ হজম করেছেন, তবু লড়াই ছাড়েননি। মানুষ বুঝেছে মমতা ব্যানার্জীর আর এক নাম লড়াই। তখনই মানুষের মনে হয়েছে—৩২ বছরের কঠিন লৌহদুর্গ ভাঙ্গতে যদি কেউ পারে—তিনি হলেন মমতা ব্যানার্জী। তাই লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁর ডাকে রাস্তায় নেমেছে, আর এবার কোটি কোটি মানুষ ভোট দিয়েছে। লৌহদুর্গ চুরমার হয়ে গিয়েছে।

আমরা হিন্দু সংহতি, তাঁর নীতির সমর্থক নই, তাঁর মুসলিম তোষণের আমরা সম্পূর্ণ বিরোধী। কিন্তু তাঁর সাহস ও অনমনীয় মানসিকতার প্রশংসা করি। তাঁর এই অভূতপূর্ব জয় থেকে আমাদের কর্মীরা যেন এই শিক্ষা নেয় যে, বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। সাহস ও সংগ্রামের কোন বিকল্প নেই। হিন্দু সমাজকে রক্ষা করতে হলে শুধু সেবা সংস্কার ও সংগঠন দিয়ে হবে না। চাই সাহস ও সংগ্রাম। এবার নির্বাচনে ইন্দ্রপতন থেকে এই হোক আমাদের শিক্ষা।

সেকুলারবাদী এদেশে ও বিদেশে

কংগ্রেস দল নিজেদের সেকুলার বলে দাবী করে। এই সেকুলাররা ভোট ব্যাঙ্কের জন্য সুকৌশলে দাঙ্গা ও হত্যালীলাকে কাজে লাগায় তার নমুনা দেশবাসী দেখেছে ১৯৮৪ সালে শিখ নিধন যজ্ঞের সময়। ১৯৭০ ও ১৯৮০ সালেও এই ট্র্যাডিশন বজায় রেখে তারা দাঙ্গা ও হত্যালীলা চালায় মীরাট, জামশেদপুর, কানপুর, ভিওয়ান্দি, ভাগলপুর, আমেদাবাদ ও হায়দ্রাবাদে। গুজরাট দাঙ্গায় নরেন্দ্র মোদির কথাই বলা হয়। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত বিশেষ তদন্তকারী দল গুলবার্গ সোসাইটি হত্যালীলায় কংগ্রেস নেতা মেঘসিং চৌধুরীকে আটক করে। এতে প্রমাণ হয় গুজরাট কাণ্ডে সেকুলার কংগ্রেস দলও ছিল জড়িত।

মার্কসবাদীরা নাকি সেকুলার। এই সেকুলাররা ভোট ব্যাঙ্কের জন্য সন্ত্রাস চালিয়ে একদিকে সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম সৃষ্টি করে, অন্যদিকে পার্ক সার্কাসে তসলিমা বিতাড়ন পর্ব বা কোলকাতার স্টেটস্‌ম্যান অফিসে তিনদিন মুসলিম তাণ্ডবে নীরব থেকে সাম্প্রদায়িক মাদানির দলকে নিয়ে একই মঞ্চ থেকে সম্প্রতি ভোট প্রচারে নেমেছিল।

ধর্মকে বাদ দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ বা সেকুলার রাষ্ট্রনায়কদের দেখুন। আমেরিকা সেকুলার, কিন্তু বিশ্বরাজনীতিতে প্রাধান্য বজায় রাখতে চারদিকে চলছে তার ধ্বংসলীলা। রাশিয়াকে সেকুলার বানাতে স্ট্যালিন মন্দির, মসজিদ ও গীর্জা ভাঙার সাথে সাথে লক্ষ লক্ষ মানুষ খুন করেছে। জিন্নাও প্রথমে ছিলেন সেকুলার। কিন্তু হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলিমদের উত্তেজিত করে মুসলিম প্রতীক ও স্লোগান যেমন ব্যবহার করলেন, তেমন তাঁর আস্থাভাজন না হওয়ায় লক্ষ লক্ষ মুসলিমদের তাঁর তৈরী পাকিস্তানে নিয়ে গেলেন না।

অথচ সনাতন হিন্দু ধর্মের গান্ধীজি, ইসলামে পরিপূর্ণ বিশ্বাস থাকা খান আব্দুল গফফর খান, বৌদ্ধ ধর্মের দলাই লামা বা খ্রীষ্টান ধর্মের মার্টিন লুথার কিং প্রমাণ করেছেন ধর্মের আঙিনায় থেকেও সেকুলার হওয়া যায়। তাই এদেশে যেমন সংসদ আক্রমণের নায়ক মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আফজল গুরুর ফাঁসি ভোট ব্যাঙ্কের জন্য যারা স্থগিত রাখে তারা সেকুলার। মুম্বই হামলায় ধরা পড়া জীবিত আজমল কাসভকে জাতীয় নিরাপত্তা আইনে অভিযুক্ত না করে বরুণ গান্ধীকে যারা ঐ আইনে জেলে পুরে রাখে তারা সেকুলার। তেমনি বিদেশেও যারা দাঙ্গা, হত্যালীলাকে ক্ষমতা ধরে রাখার হাতিয়ার করেছেন তারাই সেকুলার। ধন্য সেকুলারবাদীদের মহিমা।

জামতলায় শ্রীশ্রী রক্ষাকালী পূজা মেলায়
নিষিদ্ধ মাংস বিক্রি করতে এসে নাক খত

ঢোলা থানার অর্ন্তগত রান্না করা জামতলা গ্রামে গত ২৪ শে চৈত্র, ৭ই এপ্রিল ২৭৭ বৎসরের প্রাচীন কালী পূজার মেলায় নিষিদ্ধ মাংস বিক্রি করতে এসে ধরা পড়ে গেলো এক দুষ্কৃতী। পরিচয় গোপন রেখে ওই দুষ্কৃতী কম দামে মাংসের দোকান বসিয়েছিল। পূজা কমিটির উদ্যোক্তাদের বিষয়টি নজরে আসতে তারা বিক্রেতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে, সে উল্টোপাল্টা বলতে শুরু করে। স্থানীয় মানুষজন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। একটি প্রাচীন পূজা ক্ষেত্রে এরকম অপবিত্র কাজ তারা মানতে না পেরে ওই বিক্রেতাকে গণধোলাই দিতে শুরু করে। তবুও তার পরিচয় সঠিক না দেওয়াতে স্থানীয় যুবকরা ওই ব্যক্তির দৈহিক পরিচয় চিহ্ন দেখানোর জন্য চাপ দিলে, তখন দুষ্কৃতকারী একেবারে ভেঙে পড়ে, পায়ে ধরে কাকুতি মিনতি শুরু করে। দয়াপরবশ হয়ে তখন নাক খত খাইয়ে ওই দুষ্কৃতীকে ছেড়ে দেওয়া হয় এই শর্তে যে, সে আর কোনদিনই ওই এলাকায় কোন ব্যবসার সূত্রেই ঢুকবে না। পরে ওই দুষ্কৃতীকে দিয়ে নিজ হাতে ওই নিষিদ্ধ মাংস ফেলে দিয়ে সেই স্থানে গোবর জল ছড়া দেওয়ানো হয়।

জামতলায় ২৭৭ বছরের ওই প্রাচীন শ্রীশ্রীরক্ষাকালী পূজা উপলক্ষে শীতলামাতা ও গ্রাম্য দেব-দেবীর পূজা সহ হিন্দুধর্ম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলে সপ্তাহব্যাপী। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে ব্যাপক উৎসাহের সঞ্চার হয়। এলাকায় হিন্দু সংগঠনের কাজ রয়েছে। এবার একটি পূজা স্মরণিকাও প্রকাশিত হয়েছে।

প্রথম পাতার শেষাংশ

সন্দেশখালি থানায় বিক্ষোভ.....

নিয়ে পালিয়ে যায়। এই ঘটনায় থানা কিছুই করছে না। উল্টে থানারই এক পুলিশ অফিসার মহম্মদ আনন্দ শেখ নয়নার বাবাকে বলে 'মেয়েকে পাবে না, ওকে ত্যাজ্যপুত্র করে দাও'। এখানেই শেষ নয়, রফিকুলরা মুসলিম মহিলাদের দিয়ে নয়নার মাকে মারা থেকে শুরু করে বাড়িতে ডাকাতি সবই করছে। থানা নির্বিকার। হিন্দু সংহতির কেন্দ্রীয় দফতরে নয়নার বাবা-মা এলে তাদের পাশে দাঁড়ানো থেকে আইনিভাবে সকলপ্রকার সহযোগিতা করা হয়। এই ঘটনা নিয়ে এস.ডি.পি.ও., আই.জি.পি., সি.আই.ডি., ডি.জি.পি. সকলকে লিখিত অভিযোগ জানানো সহ সি.আই.ডি. অফিসে নয়নার মা বাবা নিজেও গিয়েছে। তিনমাস ধরে না কোন আশ্বাসবাণী না কাউকে গ্রেফতার থানা কিছুই করেনি। কাকুতিমিনতি করে কালহরণই হচ্ছে। তাই গত ৭ই মে ২০০৯ সন্দেশখালি থানায় বিক্ষোভ এবং জ্ঞাপন দেওয়া হয়। এস.ডি.পি.ও.কে এই জ্ঞাপন নেবার জন্য লিখিত আবেদন করা হয়। এস.পি. তথা আই.জি.পি.-কেও এর কপি পৌঁছে দেওয়া হয়। এস.ডি.পি.ও. না থাকতে পারায় সি.আই. নিজে এই জ্ঞাপন নেবার জন্য ছুটে আসেন। ৭ই মে বেলা ১২-০০ টায় হিন্দু সংহতির কেন্দ্রীয় নেতা তপন ঘোষ সহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে প্রায় পাঁচশত হিন্দু সংহতির কর্মী ও সদস্য এই বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করে। আশপাশের গ্রাম থেকে হিন্দু যুবকেরা মোটরসাইকেল ও গাড়িতে করে ধামাখালিতে জড়ো হয় এবং নদী পেরিয়ে সন্দেশখালি থানায় বিক্ষোভ সমাবেশে যোগ দেয়। থানার সদর দরজাতেই বিক্ষোভ দেখানো হয়। কিছু পুলিশ এসে অযথা বাদানুবাদ করলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। সংহতির সদস্যরা চরম হুঁশিয়ারী দেয়। ও.সি. লোক পাঠিয়ে নেতৃবৃন্দকের ঘরে ডেকে নিয়ে যায়। তপন ঘোষ, এ্যাডভোকেট সুভাশিষ বসুমল্লিক, প্রদীপ দাস, রামকৃষ্ণ দাস, প্রদীপ মন্ডল, শ্যামাঞ্জন শূর, নয়না সরদারের বাবা-মা, শ্রীমতী কাজল হালদার, এদের সকলকে সামনে বসিয়ে ও.সি. ও সি.আই. একঘণ্টা ধরে সব সমস্যা শোনেন। স্থানীয় আরও অনেক সমস্যা নিয়েও থানার গাফিলতির অভিযোগ করা হয়। ও.সি. নতুন এসেছেন, সি.আই. সময় চেয়েছেন। উভয়েই সময় চেয়েছেন এবং এই সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সংহতির নেতৃবৃন্দও সময় ও চরম হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

২০০৯ লোকসভা নির্বাচনের ফল

তপন কুমার ঘোষ

এবার লোকসভা নির্বাচনের ফল মানুষকে চমকে দিয়েছে। আমাদের রাজ্যে বামদুর্গ ভেঙে চুরমার। আর কেন্দ্রে চুরমার আদবানির প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন। কংগ্রেস ২০৬ টি আসন পাবে কেউ কল্পনাও করতে পারে নি। আর বিজেপি-র আসন ১৩৮ থেকে কমে ১১৬-তে দাঁড়াবে এত ঢাকঢোলের প্রচারে তাও ভাবা যায়নি। বিজেপি ভক্তরা আদবানিকে তো প্রধানমন্ত্রী বানিয়েই দিয়েছিলেন।

এবার কেন্দ্রে সম্ভবতঃ পাঁচ বছরের জন্য স্থায়ী সরকার গঠিত হবে। কিন্তু তার থেকেও বড় যে জিনিসটা হবে, তা হল রাহুল গান্ধীর পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পথটা আরও প্রশস্ত ও মসৃণ হবে। আর রাহুল প্রধানমন্ত্রী হলে দেশের স্থায়িত্ব হোক বা না হোক কংগ্রেসের স্থায়িত্ব পাকা হবে। যেমন একটা লাঠি ছাড়া গান্ধী চলতে পারতেন না, তেমনি একটা গান্ধী ছাড়া কংগ্রেস চলতে পারে না।

কংগ্রেসের এই পুনর্জীবন প্রাপ্ত হল আর.এস.এস.-এর মনোনীত আদবানির নেতৃত্বে বিজেপি-র জন্য। রামমন্দির আন্দোলন ও হিন্দুত্বের ইস্যু বিজেপিকে নিয়ে গিয়েছিল ২ থেকে ১৮২তে। তারপর এঁরা শুরু করলেন উদার ও ধর্মনিরপেক্ষ হতে। তবু কার্গিল এদের ১৮২কে ধরে রাখল। এঁরা মনে করলেন সেকুলার হয়ে রাস্তাঘাটগুলো চওড়া করলেই ১৮২টা আরও বাড়বে। তাই হিন্দুত্বের ইস্যুগুলিকে ধামাচাপা দিলেন, রামমন্দির নিয়ে ছলনা করতে লাগলেন। 'ইন্ডিয়া শাইনিং' স্লোগান দিয়ে মুখমণ্ডলে আত্মতৃপ্তি ও গর্বের আভা নিয়ে ২০০৪ সালের নির্বাচনে জনসাধারণের সম্মুখীন হলেন। ফল ১৮২ থেকে ১৩৮। তবু এদের মুখ দিয়ে 'হে রাম' বেরোল না। ইন্ডিয়া শাইনিং-এর পুরোধা পুরুষ অটলবিহারী বাজপেয়ী যে প্রদেশ থেকে এম.পি. হন, যে প্রদেশ ৯০-এর দশকে বিজে পি-র শক্ত ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছিল সেই উত্তরপ্রদেশে বিজেপি ৮০ তে ১০। তবু মুখে রামনাম বেরোল না, সেকুলারিজমের মোহ কাটল না। বাজপেয়ী ন্যাশনাল হাইওয়ে বানিয়েছিলেন। এঁরা এবার ব্রডব্যান্ড আর ডিজিটাল হাইওয়ে বানানোর প্রতিশ্রুতি দিতে লাগলেন। এঁদের দৃঢ় বিশ্বাস—রামের পথে নয়, ডিজিটাল পথেই এঁরা দিল্লীর তখতে গিয়ে বসতে পারবেন। আদবানির ওয়েবসাইট (lkadvani.in) নিয়ে সে কি হৈ হৈ। যেন আমেরিকা থেকে রাণাওয়াত ডাক্তার এনে

বাজপেয়ীর হাঁটু অপারেশন হচ্ছে। প্রমোদ মহাজন রাণাওয়াতকে এনেও বাজপেয়ীর হাঁটুর মালাইচাকি সারাতে পারল না, আর ডিজিটাল হাইওয়ে দিয়ে আদবানিরও প্রধানমন্ত্রী হওয়া হল না।

পাঠক হয়ত আমার এসব কথায় দুঃখ পেতে পারেন। কিন্তু অনেক বেদনা নিয়েই এসব কথা লিখছি। পাঠক জানেন না, এঁরা যখন কেন্দ্রে সরকারে বড় বড় মন্ত্রী ছিলেন (১৯৯৮-২০০৪), তখন নিজেদের দপ্তরে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে হিন্দু সংগঠনের কোন কর্মকর্তা যদি কোন চিঠি লেখে, তাহলে তার উত্তর তো দেওয়া হবেই না, এমনকি সেই চিঠির প্রাপ্তিস্বীকারও যেন না করা হয়। অন্য সকল চিঠির উত্তর দেওয়া হত। বাজপেয়ী পাকিস্তানে গিয়ে মাথায় সাদা কাপড় জড়িয়ে মিনার-ই-পাকিস্তান স্তম্ভে চুম্বন করে অখণ্ড ভারতের সংকল্পকে কবর দিলেন। অথচ এটা করা তাঁর জন্য বাধ্যতামূলক ছিল না। পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধানরা ভারতে এসে তাজমহল দেখতে যায়, কিন্তু রাজঘাটে গান্ধীবাবার সমাধির সামনে মাথা নোয়াতে যায় না। হজের জন্য ভারতের ৩টে শহর থেকে বিমান উড়ত, বাজপেয়ীর বিমানমন্ত্রী শাহনওয়াজ হোসেন সেটা ১২টা শহর থেকে শুরু করে দিলেন। বাজপেয়ী দু লক্ষ উর্দু শিক্ষকের নতুন চাকরি করে দেবেন বলে কিষাণগঞ্জে ঘোষণা করলেন। ঝাড়খন্ডে বিজেপি সরকার উর্দুকে দ্বিতীয় রাজ্যভাষা করলেন। ৩৭০ ধারা, সমান নাগরিক আইন এসবকে সরকারের কর্মসূচীতে কোন স্থান তো দিলেনই না, এমনকি দলীয় কর্মসূচী থেকেও ছেঁটে দিলেন। একজনও অনুপ্রবেশকারীর গায়ে হাত দিলেন না। এসবের ফল হল ২০০৪-এর পরাজয়। সাধারণ মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা বিজেপি সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলল—এরা যা বলে তা করে না। কিন্তু নেতারা তবু বুঝতে পারলেন না।

তারপর এল সোনিয়া-মনমোহনের ইউ.পি.এ. সরকার। এই সরকারে শত ব্যর্থতা। জিনিসপত্রের দাম আকাশছোঁয়া। সপ্তাহে সপ্তাহে জেহাদী হানায় নিরীহ মানুষের প্রাণ যাওয়া। সর্বশেষ ২৬/১১ মুম্বই হামলায় ভারতের মাথা নীচু হয়ে যাওয়া। এইসব ব্যর্থতার বিরুদ্ধে প্রচার করতে বিজেপি কোন ত্রুটি রাখেনি। এমনকি মুম্বইয়ের তাজ হোটেলের সামনে গোলাগুলির মধ্যে নরেন্দ্র মোদীকে পর্যন্ত পাঠিয়েছিল। আদবানির ছবিকে সামনে রেখে স্লোগান দিল 'মজবুত নেতা, নির্ণায়ক সরকার'। কিন্তু মানুষ এদের কোন কথা বিশ্বাস করল না। কারণ এরা বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছিল। তাই খোদ মুম্বই শহরেও ৬টির মধ্যে ৬টি লোকসভা আসনই কংগ্রেস পেল। বিজেপি-র নিজের শহর দিল্লীতেও ৭টার মধ্যে বিজেপি শূন্য। উত্তরপ্রদেশে বরুণ গান্ধী না হলে বিজেপি-র ১০ আরও কমে যেত। বরুণ বিপুল ভোটে (২.৩ লক্ষ) জিতলেন হিন্দু পতাকা হাতে নিয়ে। এমনকি আশ্চর্যের কথা, নরেন্দ্র মোদীর রাজ্যেও দলের আসন সংখ্যা মাত্র একটা বাড়ল, কিন্তু ভোট কমল ০.৯ শতাংশ। মোদীও বিকাশ পুরুষ রূপে নিজের ইমেজ তৈরী করতে ব্যগ্র। কে জানে এটা তারই ফল কিনা! মোট কথা, বাজপেয়ী সেকুলার পথে চলে পার্টিকে দু'বার ডুবিয়েছিলেন—১৯৮৪ ও ২০০৪-এ। আদবানিও সেই একই পথে চললেন। ইনিও পাকিস্তানে গিয়ে ভারতমাতার বিভাজনকারী জিন্নাকে সেকুলার আখ্যা দিলেন। সেই পথে চলে ২০০৯-এ আদবানি দলকে ডোবালেন। নিজেও ডুবলেন।

কিন্তু এখন বড় প্রশ্ন যার উত্তরের উপর অনেককিছু নির্ভর করছে তা হল—পার্টির সর্বোচ্চ নেতারা যে বারবার ভুল করছেন, এ কি শুধু ঐ নেতাদেরই ভুল, নাকি গোটা পার্টিটারই বাজপেয়ীকরণ ও আদবানিকরণ হয়ে গিয়েছে? শ্রী অশোক সিংহল ও আরও কিছু আশাবাদীরা মনে করেন যে উপরে কিছু নেতারই ভুল, বাকী গোটা পার্টিটা ঠিক আছে। কিন্তু অনেকের অভিজ্ঞতা অন্যরকম। সেক্ষেত্রে শ্রী অশোক সিংহলেরই ২০০১ সালের কথায় বলতে হয় যে, ভারতে আজ হিন্দুরা রাজনৈতিক অনাথ। তাদের রক্ষার জন্য কেউ নেই। তাই হিন্দুদের জন্য চাই এক নতুন রাজনৈতিক মঞ্চ।

নির্বাচনী ফলের কয়েকটি বিশেষ দিক

অমল কুমার বসু

এবার লোকসভা নির্বাচনের ফল একেবারেই অপ্রত্যাশিত। কংগ্রেস ২০০-র বেশী আসন পাবে তা নিজেরাও কল্পনা করতে পারেনি। আর বি. জে. পি. ১১৬তে নেমে যাবে সেটাও তাদের কল্পনার বাইরে ছিল। কংগ্রেসের পুনর্জীবন পেল। বি. জে. পি.-র শুধু আসন কমেনি সারা দেশে ভোটও কমেছে ৪-৫ শতাংশ। এই ফলাফলের কয়েকটি দিক পর্যালোচনা করা দরকার।

পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলে কমিউনিস্টরা পর্যুদস্ত হওয়া। বামপন্থীরা সব দোষ প্রকাশ কারাতের ঘাড়ে চাপাতে চাইছে। এটাও একটা বড় চাল। কমিউনিস্ট অপশাসন, দুর্নীতি ও স্বৈরাচারকে ঢাকা দেওয়া। কারাতের ভুল কৌশলে তৃতীয় ফ্রন্ট বুদবুদের মত মিলিয়ে গেছে। কিন্তু কমিউনিস্টরা হেরেছে তাদের কুকীর্তি অপকীর্তি ও জনবিরোধী নীতির জন্য। উত্তরভারতে হিন্দীভাষী ক্ষেত্রে কংগ্রেসের পুনরায় উত্থান চোখ এড়িয়ে যাবে না। উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেস বি. জে. পি.-র দ্বিগুণ আসন পেয়েছে। বিহারে মাত্র তিনটি আসন পেলেও কংগ্রেসের ভোট বেড়েছে ১০ শতাংশ। দিল্লি, হরিয়ানা, রাজস্থান, উত্তরাখণ্ড প্রায় দখল করে নিয়েছে। পাঞ্জাব ও জম্মু কাশ্মীরের ফলও কংগ্রেসের ভাল। বি. জে. পির মুখরক্ষা করেছে মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, হিমাচল প্রদেশ ও গুজরাট। বিহার ও কর্ণাটক বিজেপিকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। কয়েকটি প্রশ্ন উঠে আসে। জম্মুতে অমরনাথ আন্দোলনে এত বড় সাফল্যের পরও বি জে পি একটা আসনও পেল না কেন? আগে এখানে বি. জে. পির আসন ছিল। তাহলে কি যেমন প্রচার করা হয়েছিল যে এই আন্দোলন সঙ্ঘ পরিবারের উদ্যোগেই হয়েছে, তা সত্যি নয়? তামিলনাড়ুতে রামসেতু নিয়ে এত বড় সফল আন্দোলনের পরিণামটাই বা কোথায়? আর সব থেকে বড় প্রশ্ন উড়িষ্যাকে নিয়ে। এখানে বি. জে. পি.-র আসন গতবারের ৭ থেকে এবার ০ হয়েছে। ছত্তিশগড়ে খ্রীষ্টান ধর্মান্তর বিরোধী কার্যকলাপ করেও বি জে পি-র দিলীপ সিং জুদেও বিপুল ভোটে নিজে জেতেন ও দলকেও জেতান। অথচ একই রকমের ঘটনায় উড়িষ্যার আদিবাসী ক্ষেত্রে, এমন কি কন্ধমালেও (যেখানে স্বামী লক্ষ্মণানন্দের হত্যা হয়েছিল) বি জে পি জিততে পারল না কেন? স্বামীজীর হত্যার পর কন্ধমালে যে আদিবাসী জাগরণ দেখা গিয়েছিল তা কোথায় গেল? এর উত্তর সম্ভবতঃ পাওয়া যাবে গত বছর ২৫শে ডিসেম্বর বড়দিনের ঘটনায়। ঐ দিন স্বামীজীর হত্যার প্রতিবাদে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সারা রাজ্য জুড়ে বন্ধ ডেকেছিল। কিন্তু নবীন পট্টনায়কের সঙ্গে জোট সরকার বাঁচাতে আদবানি ও সঙ্ঘ পরিবারের চাপে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ঐ বন্ধ প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। ফলে সাধারণ মানুষের কাছে বহুবারের মত আবার প্রমাণিত হল যে এরা রাজনৈতিক স্বার্থটাকেই বড় করে দেখে, আদর্শের কথা শুধু মুখে। আদিবাসী সমাজ এই ছলনা মেনে নিতে পারে না।

আসামে বিজেপি ১৩টার মধ্যে ৪টা আসন পেয়েছে। কিসের ভিত্তিতে আসামের মত রাজ্যে, যেখানে সঙ্ঘ পরিবার অত্যন্ত দুর্বল, সেখানে এতগুলি আসন পায়? অনেকে হয়ত বলবেন অ. গ. প.-র সঙ্গে জোটের জন্য। না, সম্পূর্ণ ভুল কথা। অ. গ. প কি এমন এমনি জোট করে? তাদের কোন লাভ ছাড়াই? আসামে বি. জে. পি. ভোট পায়। এখন একথা ভাবা কি মূর্খামি নয় যে দিল্লী মুম্বইতে মানুষ উন্নয়নের জন্য বিজেপিকে ভোট দেয় না, আর আসামে উন্নয়নের জন্য মানুষ বিজেপিকে ভোট দেয়? সুতরাং আসামে বিজেপি হিন্দু ভোট পায়। কেন পায়? কারণ হিন্দুরা জানে তাদের অস্তিত্ব সঙ্কটে। তাই তারা বি. জে. পিকে ভোট দেয় নিরুপায় হয়ে। কোন সংগঠন ছাড়াই। সংগঠনের জন্য ভোট পেলে বি. জে. পি কেরলে অনেক ভোট পেত। কারণ কেরলে আর এস এসের শাখা সব থেকে বেশী। কিন্তু সেখানে বি. জে. পি. হিন্দু ভোট পায় না। উত্তরপ্রদেশে এই খারাপ অবস্থাতেও পিলিভিটে বরুণ গান্ধী জেতেন বিপুল ভোটে। সেটা কি হিন্দু ভোট না সেকুলার ভোট? অর্থাৎ বি. জে. পি. পায় হিন্দুর ভোট, আর মিডিয়ার প্রচারে প্রভাবিত হয়ে স্বপ্ন দেখে সেকুলারিজমের। এটা যে দশ বদমাইসের কথায় বামুনের ছাগল কুকুর হওয়ার গল্পের আর এক রূপ, তা বুঝতে পারে না। তাই হিন্দুত্ব নিয়ে ২ থেকে উঠতে উঠতে ১৮২তে ওঠার পর সেই বোকা বামুন যেমন কুকুর বলে তার ছাগলটাকে ছেড়ে দিয়েছিল, বি. জে. পি. তেমনি হিন্দুত্বকে ছেড়ে দিয়ে নামতে নামতে ১১৬তে পৌঁছেছে। আরও নামবে। অবশ্য পরিপূর্ণ কংগ্রেসীকরণ হলে আবার ওঠার চান্স আছে। বি. জে. পির নবীন প্রজন্মের নেতারা সেই চেষ্টাই করছেন।

এবার নির্বাচনে আর একটি বড় আশীর্বাদ হল বিহারের মানুষ লালু আর রামবিলাস পাসোয়ানের ধাপ্পা বুঝতে পেরে ওদেরকে ও ওদের জাতপাতের রাজনীতিকে পথে বসিয়েছে। এজন্য ভগবানকে ধন্যবাদ ও বিহারের মানুষকে অভিনন্দন। নির্বাচনী ফলের আরো বিশ্লেষণ পরবর্তীতে করা যাবে।

সংহতির কর্মী সম্মেলন

মধ্য চৈতল বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠে ২৫-২৬ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হল সংহতি কর্মী সম্মেলন। তিনটি ব্লক মিনাখাঁ, হাসনাবাদ ও সন্দেশখালি ১ থেকে প্রায় একশ কর্মী এই সম্মেলনে যোগদান করে। ২৪ ঘণ্টার এই সম্মেলনে সংগঠনের কাজকে এলাকায় বিস্তার, স্থানীয় সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে আলোচনা হয়। ২৫ এপ্রিল বিকাল ৩ টায় সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতা শ্রী তপন কুমার ঘোষ এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। অন্যান্যদের মধ্যে সম্পাদক চিত্তরঞ্জন দে ও উপানন্দ ব্রহ্মচারীও এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত যুবকরা প্রশ্নোত্তর পর্বে বলেন, এলাকায় যা পরিস্থিতি আমরা প্রত্যক্ষ করছি তাতে নিজেদের সক্রিয় হয়ে কাজে ঝাঁপানোই একমাত্র কাজ। ২৬ এপ্রিল বিকালে উপানন্দ ব্রহ্মচারীর ভাষণের মাধ্যমে সম্মেলনের সমাপ্তি হয়।

মিনাখা ব্লকে চৈতলে হিন্দু সংহতির কর্মী সম্মেলন

ক্যানিংয়ে সম্মেলন ঃ ১ মে, ক্যানিং থুমকাঠী শচীন্দ্র উমা কিন্ডারগার্টেনে একটি কর্মী সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে স্থানীয় ১২০ জন কর্মী অংশগ্রহণ করেন। প্রথম থেকেই এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন উপানন্দ ব্রহ্মচারী ও বিকর্ণ নস্কর। সমগ্র অনুষ্ঠানটি তিনিই পরিচালনা করেন।

পাকিস্তানে সুফি মসজিদ ধ্বংস

গত ৫ই মার্চ পাকিস্তানে সপ্তদশ শতাব্দীতে বাবরের রাজত্বকালে নির্মিত একটি মসজিদ উড়িয়ে দেওয়া হয়। এটি কোন অমুসলিম এলাকায় অমুসলিমদের কাজ নয়। এটি ঘটেছে পাকিস্তানের মাটি পেশোয়ারে এবং ঘটিয়েছে মুসলিমরাই। শুধু তাই নয়, এই মসজিদ পরিত্যক্ত নয়। এখানে প্রতিদিন নামাজ পড়া হত। এই মসজিদটির নামকরণ ছিল পুস্তু কবি রহমান বাবার নামানুসারে।

না, অবাক হবেন না। এ ঘটনাই ঘটেছে পাকিস্তানের সোয়াটে শরিয়ত শাসন ও শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট টিমের উপর হামলার পর। সোয়াটে তালিবানদের চোখে ক্রিকেট খেলা 'ইসলামি' নয়। মেয়েদের স্কুল কলেজে যাওয়া ইসলামি নয়। ওদের শরিয়ত আইন অনুযায়ী সুফি ইসলামের কোন স্থান নেই ইসলামে। তাই এই মসজিদটি উড়িয়ে দেওয়া হল।

প্রশ্ন হল পাকিস্তানে বা ভারতে এই মসজিদ ভাঙার বিরুদ্ধে মুসলিমদের কোন প্রতিক্রিয়া বা কোন ফতোয়া নেই কেন? উত্তর একটাই, মুসলমানে মুসলমানে মারামারি হলে ফতোয়া থাকবে না। কিন্তু হিন্দু আক্রমণে সবাই এককাট্টা হবে 'ইসলাম বিপন্ন' এর ফতোয়ায়।

ভোটের দিন রাতের অন্ধকারে পিঁয়াজগঞ্জ মসজিদ নির্মাণ করল পুলিশ

হাইকোর্টের আদেশকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে ১৩ই মে লোকসভা ভোটের দিন মধ্যরাতে উস্থি থানার ও. সি. সামসের আলি মোল্লা, শিরাকোল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান ও বর্তমান প্রধানের স্বামী গিয়াসউদ্দিন মোল্লার ইচ্ছানুসারে বেআইনী পিঁয়াজগঞ্জ জুম্মা মসজিদের অসমাপ্ত ঢালাই সম্পূর্ণ করল।

মাননীয় কলকাতা হাইকোর্ট গত ২২শে এপ্রিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে একটি নির্দেশ বলে ভূতাত্ত্বিক বিভাগের দুইজন বিশেষজ্ঞ দিয়ে ওই মসজিদ আদৌ পুরানো কিনা তা জানতে রিপোর্ট চেয়েছেন।

বিতর্কিত ওই মসজিদের নিকটেই একটি প্রাচীন কালী মন্দির রয়েছে যার ২৫০ মিটারের মধ্যে মসজিদ নির্মাণ বেআইনী। সমস্ত কোর্টে স্থিতাবস্থা ও শান্তি বজায় রাখতে বললেও উস্থি থানার ওসি রাতের অন্ধকারে (রাত ১২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত) তাঁর জাত-ভাইয়ের মদত করে পুলিশের উর্দির সম্পূর্ণ অমর্যাদা করেছেন।

প্রকাশ থাকে যে নিম্ন আদালত (ডায়মণ্ড-হারবার) গত মহরম ছুটির দিন (কেন্দ্র/রাজ্য) আদালত ও অন্য প্রতিষ্ঠান পর্যায়ের ছুটি নেগোশিয়েবল ইন্স্টুমেন্ট অ্যাক্ট অনুযায়ী) ০৮/০১/২০০৯ তারিখে বিচারক শেখর কুমার দে এই মামলার মধ্যে মগরাহাট BL & LRO (ভূমি সংস্কার দপ্তর) কে দিয়ে একটি রিপোর্ট করান। শিরাকোলে অবস্থিত গিয়াসউদ্দিনের নিয়ন্ত্রণে থাকা কর্তাভজা BL & LRO সম্পূর্ণ মিথ্যা একটি রিপোর্টে ওই গজিয়ে ওঠা মসজিদকে প্রাচীন ও ওই এলাকায় মহিষ জনগোষ্ঠী দ্বারা দীর্ঘদিনের পূজিতা কালীমাতা মন্দিরের কোন অস্তিত্ব নেই বলে জানিয়ে দেন।

হিন্দু পক্ষের উকিল এর প্রতিবাদে প্রশাসন ও স্থানীয় পুলিশকে এই মিথ্যা রিপোর্টের প্রতিবাদ করে SDL & LRO কে দিয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত দাবী করলে, তা কার্যকর করা হয় নি।

ওই অবৈধ মসজিদ নির্মাণে মুসলিম পুলিশ অফিসারের সক্রিয়তা ও তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে থাকা মুসলমান ক্ষমতাগোষ্ঠীর ব্যাপকপ্রভাব দেখে এলাকার হিন্দু জনসাধারণ প্রমাদ গনছেন।

এলাকার হিন্দু সংগঠক ও মামলা পরিচালক শম্ভু মণ্ডল ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, বেআইনী মসজিদ নির্মাণে পুলিশ সাহায্য করছে। আর সেই মসজিদ প্রাচীন কিনা তা প্রমাণের জন্য হিন্দু পক্ষকে ১৫ হাজার টাকা জমা দিতে হবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতত্ত্ব বিভাগে। স্বাধীন ভারতে হিন্দু অবমাননার এই দৃষ্টান্ত ইতিহাসে লেখা থাকবে।"

লস্কর নারী জঙ্গী তৈরী করছে

আল কায়দা আগেই নারী ফিদায়েঁ তৈরী করেছে। তাদের কাছ থেকে প্রেরণা নিয়ে এখন লস্কর-ই-তৈবাও পাকিস্তানে নারী জঙ্গী তৈরীর জন্য প্রশিক্ষণ শিবির চালু করেছে।

আমেদাবাদ ও মুম্বইতে জঙ্গী হানার অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া রিয়াজুদ্দিন নাসির ও সাহাবুদ্দিন আহমেদকে জেরা করে এই তথ্য জানা গিয়েছে। পাকিস্তানে ১৯ থেকে ২৩ বছর বয়সের মেয়েদেরকে এই কাজের জন্য মনোনীত করা হয়। তাদেরকে তিন সপ্তাহের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তাতে অস্ত্রশস্ত্রের শিক্ষা ছাড়াও কিভাবে ছদ্মবেশে কাজ করতে হয় সে শিক্ষাও দেওয়া হয়। তারপর তাদের জন্য নকল ভারতীয় পরিচয়পত্র তৈরী করে দেওয়া হয়। সম্প্রতি এইরকম প্রশিক্ষিত পাঁচজন মহিলা জঙ্গীকে ভারতে পাঠানো হয়েছে কয়েকটি শহরে পর্যবেক্ষণ করার জন্য।

লস্কর-ই-তৈবার এই নারী জেহাদী জঙ্গী বাহিনীর নাম দেওয়া হয়েছে 'দৌরা-ই-সোফা'। গত বছর শ্রীনগরে ধৃত খালিদা আখতারকে জেরায় জানা যায় যে পাকিস্তানে উমি হামাদ নামে মহিলা এই 'দৌরা-ই-সোফা'-র নারী জেহাদীদেরকে ট্রেনিং দেওয়ার দায়িত্বে আছেন।

[সূত্র ঃ টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া]

পাকিস্তানে শিখদের উপর জিজিয়া কর ধার্য

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের সময় পশ্চিম পাকিস্তানে লক্ষ লক্ষ শিখকে হত্যা করা হয়েছিল। তার ফলে সমস্ত শিখ উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে চলে এসেছিল যার মধ্যে ডঃ মনমোহন সিং এবং তাঁর পরিবারও ছিল। তখনও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ওরাকজাই অঞ্চলে ফিরোজ খেল গ্রামে ৩৫টি শিখ পরিবার ওখানেই থেকে গিয়েছিল, তারা চলে আসেনি। কিন্তু এবার তাদেরও এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়া শুরু হল পাকিস্তানে একটি টি.ভি চ্যানেল Geo T. V. জানিয়েছে যে ওখানে তালিবান জঙ্গীরা ঐ শিখ পরিবারগুলির দোকান ও ঘরবাড়ি দখল করে নিয়েছে এবং তাদের দু'জন নেতা সেবা সিং ও ক্লান্ক সিংকে গ্রেফতার করেছে। তারপর স্থানীয় জিগ্‌রা (ট্রাইবাল গ্রাম প্রধানদের কমিটি) আদেশ দিয়েছে যে ঐ শিখদেরকে বছরে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা দিতে হবে তাদের প্রোটেকশান মানি হিসাবে। তালিবানরা এর আগে ৫ কোটি টাকা চেয়েছিল। পরে ঐ পরিমাণ কমিয়ে দেড় কোটি টাকা করা হয়। ঐ ৩৫ টি শিখ পরিবার এই টাকা দিতে তাদের অক্ষমতা প্রকাশ করে। তখন তালিবানরা ঐ শিখদের বাড়ি ও অন্য জিনিসপত্র নিলাম করে বিক্রি করে দেয়। সংবাদে প্রকাশ যে, জঙ্গীরা শিখদের কাছ থেকে এই জিজিয়া কর না পেয়ে তাদের ১১টি বাড়ি ভেঙে দেয়। ফলে শিখরা বাড়ি ছেড়ে পলায়ন করতে বাধ্য হয়। ভারত সরকারের বিদেশ দফতরের মুখপাত্র শ্রী বিষ্ণু প্রকাশ দিল্লিতে জানিয়েছেন, 'পাকিস্তানে শিখদের উপর এই অত্যাচারের ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে পাকিস্তান সরকারের কাছে অভিযোগ করা হয়েছে।'

ভারতে সেকুলারিজমের ধ্বজাধারীদের কাছে শিখদের উপর এই নির্মম অত্যাচারের কোন গুরুত্ব নেই। প্যালেস্টাইনের মুসলিমদের উপর ইহুদীদের অত্যাচার নিয়ে ভারতের সেকুলারিস্টরা আন্দোলন করে। কিন্তু পাকিস্তানে সংখ্যা লঘু শিখদের উপর অত্যাচার করে তাদেরকে বিতাড়ন করলেও এই সেকুলারদের চোখে তা পড়ে না। কারণ এই ক্ষেত্রে অত্যাচারীরা যে মুসলমান। ভারতে সেকুলারিজম্ শব্দটার মানেই হচ্ছে মুসলমানদের কোন অন্যায় না দেখা। আর হিন্দু নিজের উপর অন্যায়ের প্রতিবাদে কথা বললেও তারা হবে সাম্প্রদায়িক।

"যে ধর্ম তার অনুগামীদের শিক্ষা দেয়, দস্যুবৃত্তি ও হত্যা ধর্মীয় কর্তব্য, পুণ্যের কাজ —সে ধর্ম মানব জাতির উন্নতির পরিপন্থী; বিশ্বশান্তির পক্ষে বিপজ্জনক" — বলেছেন প্রবাদপ্রতিম ঐতিহাসিক স্যার জে. এন. সরকার তাঁর ভবিষ্যদ্ বাণী আজ সত্য বলে প্রমাণিত। সারা পৃথিবী, বিশেষ করে খণ্ডিত ভারত আজ ইসলামি জেহাদে রক্তাক্ত, বিধ্বস্ত, বিপন্ন হিন্দু জাতির অস্তিত্ব। এর প্রতিকার কি? জানতে হলে পড়ুন।

তপন কুমার ঘোষ ও নিত্যরঞ্জন দাস রচিত

ধর্ম—ধর্মনিরপেক্ষতা ও ইসলামি জেহাদ

প্রাপ্তিস্থান

টুইন প্রকাশনী

১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

ফোনঃ ২৩৬০ ৪৩০৬, মোবাইলঃ ৯৮৩০৫৩২৮৫৮

প্রকাশক, মুদ্রক ও সত্ত্বাধিকারী প্রকাশ চন্দ্র দাস কর্তৃক ৫, ভুবন ধর লেন, কলকাতা - ৭০০ ০১২ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ চিত্তরঞ্জন দে

ফোন ঃ ০৩৩-২২৫৭ ২৬৮৮, ৯৪৩৩৪ ৫৩১০৯, ইন্টারনেট ঃ http://hindusamhati.blogspot.com, ই-মেল ঃ prokash.das@rediffmail.com